গণপতি-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার

সিপিআই (মাওবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক গণপতি-র সঙ্গে জাঁ মিরডাল এবং গৌতম নাভালকার এই সাক্ষাৎকারটি জানুয়ারি, ২০১০-এ গৃহীত

প্রশ্ন: *এই সংগ্রামকে, ভারতের সাধারণ সংগ্রামের সঙ্গে শ্রেণী ভিত্তিতে কী ভাবে সম্পর্কিত করার কথা ভাবছেন? ১৯৩৫ সালের পর, চেয়ারম্যান মাও লঙ মার্চকে ইয়েনানে নিয়ে গিয়ে, সেখানে জাতীয় স্তরে ঘাঁটি নির্মাণ করেছিলেন যার অন্যতম অংশ ছিল চিয়াং-কাই-শেকের সহিত যুক্তফ্রন্ট। ফলত, এটাই চীনের মূল জাতীয় শক্তি হিসাবে দেখা দেয়। ভারতে আপনারা কী প্রকারে জাতীয় শক্তিতে পরিণত হওয়ার কথা ভাবছেন?*

উত্তর: চীনে যে অবস্থায় ইয়েনান পর্যন্ত লঙ মার্চ সংগঠিত করা এবং চিয়াং-কাই-শেকের সহিত যুক্তফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে ঘাঁটি নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল, ভারতে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে তার পার্থক্য আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চীনে বিপ্লব হয়েছিল। তারপর থেকে পৃথিবীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আবির্ভাব এবং পরবর্তী সময়ে ভাঙন; দ্বিতীয়ত, উপনিবেশ-বাদের পতন ও নয়া-উপনিবেশবাদের আবির্ভাব; তৃতীয়ত, সমগ্র বিশ্বে সাধারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা; চতুর্থত, ভিয়েতনাম, কয়েকটি দেশে কিছু অভ্যুত্থান এবং উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম সত্ত্বেও, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া ও লাওসে সফল বিপ্লবের পর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে বিশাল ব্যবধান। বিশ্ব ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায়, শ্রমিকশ্রেণী আবির্ভাবের পর থেকেই বুর্জোয়াশ্রেণী এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত। প্যারিসে অল্প সময়ের জন্য তারা ক্ষমতাও দখল করে। তারপর রাশিয়া, চীন এবং ইওরোপের বেশ কয়েকটি দেশে ক্ষমতায় এসে পৃথিবীকে চমকে দেয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই গতিপথে বিশ্বে অনেক উত্থান-পতন হয়েছে, কিন্তু সংগ্রামে ছেদ পড়ে নি। কখনো ঢেউয়ের মতো উত্তাল, কখনো মন্দীভূত— কিন্তু স্তব্ধ হয়ে যায় নি। সুতরাং, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই আমাদের কোন দেশের বিপ্লবকে বিচার করতে হবে।

আমাদের বিপ্লব প্রসঙ্গে, প্রথমে আমি আমাদের ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৪, মাওবাদী বিপ্লবী ধারার দুইটি অংশ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) ও মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টার (এমসিসি) একত্রিত হয়ে আমাদের ঐক্যবদ্ধ পার্টি— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) গঠিত হয়। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরী এবং শিক্ষক কমরেড চারু মজুমদার ও কমরেড কানাই চ্যাটার্জি সিপিআই এবং সিপিআই (এম)-এর সংশোধনবাদ এবং নয়া সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত এবং রাজনৈতিক লড়াইয়ে ধারাবাহিকভাবে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন।

একমাত্র এই সব সংগ্রামের ফলেই সংশোধনবাদী পার্টিগুলির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক বড়ো ধরণের পরিবর্তন এসেছিল। কমরেড চারু মজুমদার এবং অন্যান্য প্রকৃত মাওবাদীদের সমস্ত স্তরে এই লড়াই-সংগ্রামের পরিণতিতে মহান নকশালবাড়ি সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান বসন্ত-বজ্রের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। এর পর নতুন এক ইতিহাস শুরু হয়। তারপর থেকে আমাদের দুই মহান নেতা নকশালবাড়ির লাল পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করতে থাকেন। বিপ্লবী সংগ্রাম দেশের প্রায় সকল প্রান্তে দাবানলের মতো নতুন মাত্রায় বিস্তৃত হয়েছিল। এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ ধরেই, খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে, কমরেড চারু মজুমদার ও কানাই চ্যাটার্জির নেতৃত্বে, ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল এবং ২০ অক্টোবর, যথাক্রমে সিপিআই (এম-এল) ও এমসিসি পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু ঐতিহাসিক কারণে সেই সন্ধিক্ষণে আমরা ঐক্যবদ্ধ মাওবাদী পার্টি গঠনে ব্যর্থ হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের ভাবাদর্শ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা, বিপ্লবের পথ ও রণনীতি এবং সেই সময়ে আলোচিত আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত অভিন্ন ছিল।

নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষি অভ্যুত্থান সহ সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রামের উপর ভারতের শাসকশ্রেণী ব্যাপক সন্ত্রাস নামিয়ে আনে। ১৯৭২-এর শেষে কমরেড চারু মজুমদারের গ্রেপ্তার ও শহীদের মৃত্যুবরণের পর, এমন কী তার আগেও আমরা অনেক নেতা ও কর্মীকে শত্রুর হাতে হারিয়েছি। এই শক্তিক্ষয়ের কারণেই সমগ্র দেশে আমাদের পিছু হঠতে হয়েছে। ১৯৭১ সালে, কমরেড চারু মজুমদার শহিদ হওয়ার আগেই, এসএনএস (সত্যনারায়ণ সিনহা— অনু.) এবং অন্যান্যদের চরম দক্ষিণপন্থী চক্রের বিরুদ্ধে তীব্র অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু হয়। আমাদের গুরুতর রণকৌশলগত ত্রুটি, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি, সঠিক নেতৃত্বের অভাব এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে দুই লাইনের সংগ্রামের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে,পার্টি অনেকগুলি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৭২-এর জুলাই থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত আমাদের পার্টি সিপিআই(এম-এল) একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অধিকাংশের নেতৃত্বে ছিল দক্ষিণপন্থী অথবা বাম হঠকারীরা। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা

Second Time

বিরাজ করতো। অন্যদিকে এমসিসি-র নেতৃত্বে কাঁকসায় সশস্ত্র বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম শুরু হয় এবং অচিরেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে বিপর্যয় ঘটে। কিন্তু বিহারে এবং আসাম, ত্রিপুরার কয়েকটি অঞ্চলে ধীরে ধীরে সংগ্রাম বিস্তার লাভ করে।

একটি প্রকৃত মাওবাদী পার্টির মতাদর্শ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে আমরা উর্ধ্বে তুলে ধরি। আমরা অনুশীলন থেকে শিক্ষা নিয়েছি, শ্রেণী সংগ্রামে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত থেকেছি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যে বিষয়গুলির মোকাবিলা করতে হয়েছে, সেখানে দৃঢ়ভাবে সঠিক অবস্থান বজায় রেখেছি। এই অবস্থান গ্রহণের সূত্রে সিপিআই(এম-এল) ধারা থেকে, ১৯৭৮ সালে সিপিআই(এম-এল)-পার্টি ইউনিটি (পিইউ) এবং ১৯৮০-এর ২২ এপ্রিল সিপিআই-পিপলস ওয়ার(পিডব্লিউ) জন্ম নেয়। তার ফলে আবার আমরা, এমসিসি, পিডব্লিউ এবং পিইউ পার্টি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারে, সশস্ত্র বিপ্লবী কৃষি সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলাম। আশি ও নব্বইয়ের দশকে আমরা আমাদের পার্টি, বিপ্লবী গণ-সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রামকে বিশেষ জোরদার করে তুলেছিলাম, যার পরিণতিতে মহান ঐক্য অর্জন এবং ২০০৪-এর সেপ্টেম্বরে নতুন পার্টি গঠন সম্ভব হয়েছিল। ১৯৭৭ থেকে প্রকৃত মাওবাদীদের এক বড়ো অংশ সিপিআই-এমএল (পিডব্লিউ), এমসিসিআই এবং সিপিআই-এমএল (পিইউ) পার্টিগুলির সহিত সংযুক্ত হয়েছে এবং সংগঠিত হয়েছে। নতুন পার্টি গঠনের পরেও এই প্রক্রিয়া জারি আছে। এই সময়কালের মধ্যে অধিকাংশ দক্ষিণ ও বাম মাওবাদী গোষ্ঠী ক্রমাগত খণ্ডিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে। কিছু দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী, দুর্বল হলেও, এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অতি ক্ষুদ্র একটি মাওবাদী গোষ্ঠী দীর্ঘকাল সংকীর্ণতাবাদে ভুগলেও এখনও টিকে আছে।

আমরা মনে করি, কমরেড মাওয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে মহান সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল, সিপিআই ও সিপিআই(এম)-এর অভ্যন্তরে আমাদের সংগ্রাম সেই সংগ্রামের অবিচ্ছিন্ন অংশ। আমরা এটাও মনে করি, কয়েক বছর ধরে সিপিআই(এম-এল)-এর মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ বিতর্ক বিরাজমান ছিল, তা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে, সিপিসি-র অভ্যন্তরীণ বিতর্কের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা সে মাওয়ের মৃত্যুর আগে হোক বা পরে। চীনে যারা ক্ষমতা দখল করেছে, সেই আধুনিক সংশোধনবাদী দেঙ চক্র শুধুমাত্র যে আমাদের পার্টির এবং বিপ্লবের ক্ষতিসাধন করেছে তাই নয়, বিশ্ব বিপ্লবেরও ক্ষতি করেছে। আমরা মাও চিন্তাধারায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। দেঙ ও লিন পিয়াও চক্রের আমরা বিরোধিতা করি। আমাদের অভিজ্ঞতায় এটা সুস্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিকাশে ভারতের বিপ্লব প্রভাব বিস্তার করেছে।

আমরা, ভারতীয় মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘকাল কষ্টকর পথ অতিক্রম করে এসেছি। ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠনের পর, বিপ্লবের অগ্রগতির পক্ষে সব থেকে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৬৯ এবং ১৯৭২- এ আমরা সুবিধাজনক সুযোগ নষ্ট করেছিলাম। ঐক্যের সবথেকে বড়ো অবদান, ৩৫ বছরের ভারতীয় বিপ্লবের অভিজ্ঞতার সমন্বয়। দূরবর্তী বিভিন্ন স্থানে বা ছোট ছোট অঞ্চলে কর্মরত দুটি পৃথক পার্টির, সর্বভারতীয় চরিত্রের একটি পার্টিতে মিলন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত করেছে। দুটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থাকা সত্ত্বেও, ঐক্যের আগে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে সেগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুতর সীমাবদ্ধতা ছিল। ঐক্যসাধনের পর, দেশের ও বিপ্লবী আন্দোলনের অসম বিকাশ সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়া বৃদ্ধি পেল। এখন আমরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনেক ভালোভাবে পরিকল্পনা করতে পারি। এখনও সম্পূর্ণ না হলেও, অন্তত অসুবিধাগুলি দূর করা গেছে। ভারত এবং বিশ্ব, দুই প্রসঙ্গেই, সমৃদ্ধতর ও স্বচ্ছতর দিশা উদ্ভাবিত হয়েছে। অন্য একটি দিক হলো, আন্তর্জাতিক স্তরে এই ঘটনা প্রভাব ফেলেছে। আগে আমরা কখনো আন্তর্জাতিক স্তরে এত সমর্থন পাই নি। যদিও এখনও অপরিণত, তবুও তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। আমাদের ভাবতে হবে, কীভাবে এত ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ, ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ভুলত্রুটি সংশোধন করতে হবে এবং সাহসের সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হবে।

এখন আমাদের দেশে, অন্যান্য মাওবাদী পার্টিগুলির দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কারণে, জনগণকে নেতৃত্বদানের অবস্থানে নেই। প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কোন মৌলিক বিপ্লবী কর্মসূচি নেই এবং খুব কম অঞ্চলেই তাদের প্রভাব আছে। এ সব সীমাবদ্ধতা ছাড়াও, আত্মরক্ষার জন্য কোন পার্টিরই জনগণের সশস্ত্র ফৌজ নেই। আমি আবার বলছি, বর্তমানে কোন একটি পার্টি বা সংগঠনের পক্ষে এককভাবে সমস্ত বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং দেশপ্রেমিক শক্তি ও মানুষের সমাবেশ কেন্দ্র হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

অতএব, বর্তমান সন্ধিক্ষণে সমস্ত বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং দেশপ্রেমিক শক্তি ও মানুষকে সমবেত করতে আমাদের পার্টি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আমাদের পার্টির সর্বভারতীয় চরিত্রের কারণে অনেক রাজ্যে ভালো রাজনৈতিক ও সংগ্রামী গণভিত্তি আছে। পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ) অনেক রাজ্যে শত্রুর মোকাবিলা করছে এবং দণ্ডকারণ্য (অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও উড়িষ্যা) এই পাঁচ রাজ্যের আদিবাসী

Second Time

অধ্যুষিত মধ্য ভারতের একটি অঞ্চল), ঝাড়খন্ড এবং ভারতের অন্য কিছু অঞ্চলে নয়া জনগণতান্ত্রিক ক্ষমতা কায়েম করছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সকল বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক শক্তি ও নিপীড়িত জাতিসত্তা সহ সকল নিপীড়িত সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট বোঝাপড়া আছে। শ্রমিক, কৃষক, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়া— এই চারটি গণতান্ত্রিক শক্তির সমন্বয়ে আমাদের নয়া গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট গঠিত। যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করতে হলে তা অবশ্যই শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে করতে হবে। আমরা যদি শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে চাই, তাহলে তাকে অবশ্যই জনগণের বাহিনীর সমর্থন ও সহায়তা অর্জন করতে হবে। জনগণের বাহিনী ছাড়া জনগণ কোন কিছুই অর্জন বা রক্ষা করতে সমর্থ হবে না। অতএব, ভারতীয় জনগণের বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে, আমাদের পার্টি নেতৃত্বকে নির্মূল করতে শত্রুপক্ষ গভীরভাবে সচেষ্ট। সেই কারণে একটি কেন্দ্রে সমবেত হওয়ার পরিস্থিতি আরও পূর্ণতা লাভ করেছে এবং বিপ্লব সিপিআই (মাওবাদী)-র নেতৃত্বে অগ্রসর হতে পারে।

একই সাথে, বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট, ভারতীয় শাসকশ্রেণীর জনবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-অভিমুখী নীতি এবং ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় নিপীড়নদেশের আমজনতাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলার ফলে, বিশেষত যখন একটি বিপ্লবী পার্টি বর্তমান, বিপ্লবী সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কমরেড চারু মজুমদারের শহিদ হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন ভারত একক বিপ্লবী মঞ্চের অভাব অনুভব করে এসেছে। আন্তর্জাতিক স্তরেও মাওবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। এই রকম এক মুহূর্তে আমাদের পার্টির আবির্ভাব জনগণের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

আমি বলতে চাই যে তথাকথিত সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে পার্টির কোন মোহ নেই। ভারতীয় রাজ্যগুলিকেও জানি। ঐক্য তথা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) গঠনের পরেও, আমাদের সীমাবদ্ধতা এবং ত্রুটিগুলি সম্পর্কে এবং দেশে ও বিদেশে মাওবাদীদের দুর্বলতা প্রসঙ্গে আমরা সম্যক অবহিত।

অনুকূল বিপ্লবী পরিস্থিতি, ভারতীয় সমাজে উদ্ভূত ব্যাপক ও তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম এবং সশস্ত্র সংগ্রামের বিকাশ শত্রুপক্ষের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে আছে। তারা খুব গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টিকে দেখছে। সাম্রাজ্যবাদের দোসর ভারতের শাসকশ্রেণী এই সংগ্রামকে কোন সুযোগই দিচ্ছে না। সুতরাং বিশ্ব বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে, ফিলিপিনস, পেরু, নেপাল ও ভারতের অভিজ্ঞতা ধরে, সাম্রাজ্যবাদ এখন ভারতে বিকাশমান তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে সবথেকে বেশি উদ্বিগ্ন। বর্তমান পরিস্থিতিতে, ভারতের মাওবাদী বিপ্লব যদি নূতন কোন অবস্থানে উন্নীত হতে পারে, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে তা গুরুতর আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেই কারণেই, সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত আমেরিকা, পরিস্থিতির এই বিকাশকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে।

সুতরাং একদিকে বিপ্লবের অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতি, অপরদিকে বিপ্লব দমন করতে শত্রুপক্ষের পুরোদস্তুর আক্রমণ। আমাদের পরিকল্পনা হলো বর্তমান পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং শত্রুর প্রতিরোধ— যার ওপর আমাদের পরিকল্পনা নির্ভর করবে।

এই প্রসঙ্গে, শত্রুপক্ষ যে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাচ্ছে, বর্তমানে ভারতীয় বিপ্লবের সেটাই হলো প্রধান বাধা। এই যুদ্ধ মূলত মাওবাদীদের বিরুদ্ধে, কিন্তু সেখানেই সেটা থেমে থাকে নি। এই যুদ্ধের লক্ষ্য সকল বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং দেশপ্রেমিক আন্দোলন, নিপীড়িত জাতিসত্তা সহ সমাজের নিপীড়িত গোষ্ঠীর আন্দোলনগুলি। এইরকম এক মুহূর্তে এই শক্তিগুলির সম্মিলিতভাবে ভাবা প্রয়োজন এই প্রবল শত্রুর মোকাবিলার পন্থা কী এবং এই উদ্দেশ্যে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায়।

এই সর্বাত্মক যুদ্ধ সমস্যার সমাধান আমরা কীভাবে করতে পারি? কোন সমস্যার সমাধানের জন্য সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করার জন্য আমাদের গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রথমত, কেন এই যুদ্ধ? কে চাপিয়ে দিচ্ছে? কার ওপর চাপানো হচ্ছে? এই যুদ্ধের প্রকৃতি কী? কতদিন এটা চলবে? এই যুদ্ধ আমরা মেনে নিতে পারি, কি পারি না? কাদের এর বিরোধিতা করা উচিত? কীভাবে বিরোধিতা করা হবে? যুদ্ধ প্রতিরোধের লক্ষ্য কী? ইত্যাদি।

লালগড় থেকে সুরজগড় পর্যন্ত আদিবাসী ও সাধারণ মানুষ অধ্যুষিত বিশাল এলাকার খনিজ এবং অন্যান্য মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনকারী এবং দেশের বিদ্যমান প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে যে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির ধীরে ধীরে উন্মেষ হচ্ছে, সেই বিপ্লবকে বিনাশ করার জন্যই এই যুদ্ধ। যারা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ মাওবাদী বিপ্লবী, বিশাল জঙ্গলের আদিবাসী ও সাধারণ অধিবাসী, শ্রমিক, কৃষক, শহুরে মধ্যবিত্ত, ছোটো ও মধ্য বুর্জোয়া, দলিত, নারী সম্প্রদায়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও নিপীড়িত জাতিসমূহ, গণতান্ত্রিক সংগঠন, প্রগতিশীল এবং দেশপ্রেমিক শক্তি— জনসংখ্যার যারা ৯৫ শতাংশের অধিক— তাদের উপর এই যুদ্ধ ওরা চাপিয়ে দিচ্ছে। এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ অনৈতিক। মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, দেশের সামন্ততান্ত্রিক শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত আমেরিকা এই যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। ...যতদিন না তাদের অভীষ্ট সাধিত হচ্ছে, ততদিন তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

শাসকদের চাপিয়ে. দেওয়া এই অনৈতিক যুদ্ধ কোন মাওবাদী, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক এবং জনগণ এ

Second Time

যুদ্ধ মেনে নিতে পারে না। জনগণ সর্বপ্রকারে এই অনৈতিক, অতীব নিষ্ঠুর, অমানবিক ও বিশ্বাসঘাতক যুদ্ধের বিরোধিতা করবে। শ্রেণীসমাজের সমগ্র ইতিহাসে জনগণ কোন অন্যায় যুদ্ধ কখনোই চিরদিন সহ্য করে নি বরং নিজেদের রক্তের মূল্যে তারা প্রতিটি অন্যায় যুদ্ধের প্রতিরোধ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছে। এই ন্যায় যুদ্ধের আশু লক্ষ্য অন্যায় যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা এবং তারপর বিদ্যমান সমাজ-ব্যবস্থা, যা এই অন্যায় যুদ্ধের সুযোগ করে দিচ্ছে, তার পরিবর্তন করা। দেশের রাজনৈতিক বিকাশের প্রতি চোখ রাখলে আমরা বুঝতে পারবো, এই অমানবিক সর্বাত্মক যুদ্ধ দেশের বিপুল জনসমষ্টিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দারুন সুযোগ দিয়েছে এবং শাসকশ্রেণীর পক্ষে যা বিরুদ্ধ-ফলদায়ী হয়ে উঠবে।

১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর পর এর আগে কোনোদিন ভারতীয় অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি এবং সমগ্র রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এরকম গাঁটছড়া বাঁধতে দেখা যায় নি। পরমাণু চুক্তি ও আরো কয়েকটি প্রতিরক্ষা চুক্তি, ২৬ নভেম্বর ২০০৮-এ মুম্বাইতে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পর দৃষ্টিকটু হস্তক্ষেপ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরমের আমেরিকা ভ্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। এই তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা দক্ষিণ-এশিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় জনগণের মৌলিক দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিরাট সুযোগ এনে দেবে।

কয়েক দশক জুড়ে কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্ব ভারত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার জন্য প্রচণ্ড পরিবর্তন এসেছে। ঐতিহাসিক তেলেঙ্গানা সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের সময়ে (১৯৪৬-৫২) এবং ১৯৬৭ সালে মহান নকশালবাড়ি সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের পর কিছু সময়ের (১৯৭১ সালে) জন্য ভারতীয় সেনা নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু আজ দীর্ঘস্থায়ী পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং অন্য দেশের সঙ্গে আধুনিক যুদ্ধের প্রয়োজনে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনীন লড়াইয়ের নামে তিন বছর আগে ভারতীয় সেনা নতুন নীতি ঘোষণা করেছে (সাব-কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ার নীতি)। পুনর্গঠিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, সন্ত্রাস-বিরোধী ব্যাপক অভিযানের প্রয়োজনে ভারতীয় সেনা বহুসংখ্যক সৈন্যকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। দেশের বিশাল এলাকা জুড়ে ভারতীয় সেনাকে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার নামে, তাদের নিজেদের দেশবাসীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারত সরকার যদি সত্যই জনগণের সরকার হয়, তাহলে স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে নিজ সেনা ব্যবহার করে কী করে? গণতন্ত্রের আড়ালে ভারত রাষ্ট্র স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্ট শাসন চালাচ্ছে। বিপ্লবী এবং জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ফলে অর্জিত সমস্ত সুবিধাগুলি ফ্যাসিষ্টরা অস্বীকার করছে। কিন্তু এসবই জনগণের সুবিশাল অংশকে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং আত্মরক্ষার্থে যে কোন উপায়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য করবে। পরিণামে শাসকশ্রেণীর পক্ষে বিরুদ্ধ-ফলদায়ী হয়ে উঠবে।

বিশ্বব্যাপী চলমান অর্থনৈতিক সংকট, বিশেষত মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের সংকট প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা করা উচিত। এই সংকট, কয়েকটি দিক দিয়ে, ১৯৩০-এর মন্দার থেকেও গভীরতর। কিন্তু বিপ্লব ছাড়া পুঁজিবাদের মৃত্যু নিজের থেকে হয় না। এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে, সাম্রাজ্যবাদ নিজ দেশগুলির শ্রমিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর শোষণ বৃদ্ধির প্রয়াস নেবে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর লুণ্ঠনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। বহুজাতিক সংস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াগোষ্ঠী বাংলার লালগড় থেকে মহারাষ্ট্রের সুরজগড় পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল অঞ্চলে জমায়েত হয়েছে। প্রধানত আদিবাসী অধ্যুষিত এই সমৃদ্ধ অঞ্চলটিকে শোষণ করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি ১০০টির উপর মউ (মেমোরাণ্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং) সই করেছে। নির্বিচার লুণ্ঠন পরিবেশ ধ্বংস করবে ও বাস্তুতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ডেকে আনবে। এই দেশের সবথেকে বেশি নিপীড়িতগোষ্ঠী, আদিবাসীরা এবং স্থানীয় মানুষ ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি। সম্ভবত বিশ্বে এই প্রথম এত বেশিসংখ্যক আঞ্চলিক মানুষ একসঙ্গে বিপদগ্রস্ত হতে চলেছে। নতুন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং নির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে এই নিপীড়িত জনসমষ্টিকে অগ্রসর হতেই হবে। এটা স্পষ্ট, এইসব মানুষের মুক্তি না মেলা পর্যন্ত আমরা এগোতে পারব না, ভারতের বিপ্লবও সফল হবে না। আমাদের পার্টি এই সমস্যা নিয়ে কাজ করছে। ভারতীয় জনগণের চরম শত্রু সাম্রাজ্যবাদ, মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, সামন্ততন্ত্র ও ফ্যাসিস্ট শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আরো আরো বেশি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

উত্তর-পূর্বের নিপীড়িত জাতিগুলি এবং কাশ্মীরীরা কয়েক দশক ধরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। কিছুটা তারা অগ্রসর হয়েছে এবং বেনজির পীড়নের সম্মুখীন হয়েছে। এখনও তারা সফল হয় নি এবং লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। গেরিলা যুদ্ধে আমাদের কিছু কিছু সাফল্য লাভের পর, তারা (নিপীড়িত জাতিগুলি) মাওবাদীদের মধ্যে আশা দেখতে পারছে। নতুন এক আশার সঞ্চার হয়েছে, মাওবাদীদের বিপ্লব অগ্রসর হলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামও ত্বরান্বিত হবে। এই প্রসঙ্গে পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ অনুসারে, সকল নিপীড়িত জাতিগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সবসময়

Second Time

মেনে এসেছে। নিপীড়িত জাতিগুলি এই নীতি বোঝে এবং তাদের সংগ্রামকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাদের সঙ্গে ঐক্যের জন্য এটাকে কাজে লাগাতে হবে এবং যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ছত্তিশগড়ে যখন নাগাবাহিনী নিয়োগ করা হয় অথবা এখানে মিজো ব্যাটেলিয়ান নিয়ে আসা হয়, নাগাল্যান্ডে এবং মিজোরামে সৈনিকদের পরিবার ও গণতান্ত্রিক মানুষদের তরফে কিছু কিছু প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, তারা যুদ্ধের বিরোধিতা করে; অন্য মানুষদের দমন করার জন্য তারা তাদের সন্তানদের পাঠাতে রাজি নয়। রণনীতিগতভাবে, সকল জাতি, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় পুঁজিবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করার অনেক ভালো পরিস্থিতি তৈরি করছে এবং জনগণের উপর সর্বত্র যে দমননীতি চলছে, তা ক্রমশ শাসকদের পক্ষে বিরুদ্ধ-ফলদায়ী হয়ে উঠছে।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং মাওবাদীদের বিপদের ছুতোয় শত্রুপক্ষ জনগণের উপর সর্বব্যাপী যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। দেশের বেশ কয়েকটি গ্রামাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে আমরা শক্তিশালী। কিন্তু বর্তমানে আমাদের শক্তি কম, শহরাঞ্চলে আমরা দুর্বল, শ্রমিক এবং পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যেও আমাদের শক্তি দুর্বল। জনগণের বাহিনী খুবই দুর্বল এবং অস্ত্রশস্ত্রও শত্রুপক্ষের তুলনায় নিম্নমানের। এগুলো আমাদের সাধারণ দুর্বলতা। আমাদের কয়েকটি জরুরি কর্তব্যের অন্যতম হচ্ছে জনগণের বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা এবং শহরাঞ্চলে কাজ করা। ঐক্য কংগ্রেস স্পষ্ট রণনীতি ঘোষণা করেছে এবং এই সব ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য উন্নত মানের দলিল পেশ করেছে। অপরদিকে সামাজিক দ্বন্দ্ব খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সব জরুরি কর্তব্যের সাথে সাথে আমাদের পার্টি আরো বেশি বেশি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার বিষয়ে মনোযোগ আরোপ করেছে। যদি সফল হই, বিপ্লবের ক্ষেত্রে উল্লম্ফন ঘটবে। যুক্তফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। নতুন পরিস্থিতিতে এটা ভারতীয় বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এটা শুধু আমাদের কর্তব্য নয়, সকল বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তির এটা কর্তব্য।

এর সঙ্গে সঙ্গে শত্রু শ্রেণীর মধ্যেও দ্বন্দ্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নন্দীগ্রামের লড়াই এবং কিছু পরিমাণে লালগড়ের সংগ্রামে এটা দেখা গেছে। আমরা এই দ্বন্দ্ব কাজে লাগাচ্ছি এবং শ্রেণীসংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বত্র এটা কাজে লাগানো প্রয়োজন। আমরা অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠন এবং মানুষ, শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিছু ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে কৌশলগত ফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে জনগণের বিভিন্ন স্বার্থে কাজ করছি। আমদের এবং সকল সংগ্রামী পার্টি ও জনতাকে, এদের সঙ্গে ঐক্য ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের গুরুত্ব বুঝতে হবে। আমরা জনগণের সঙ্গে ঐক্য এবং রণনীতিগত ও কৌশলগত যুক্তফ্রন্ট গঠনে জোর দিচ্ছি। রণনীতিগত যুক্তফ্রন্ট হবে, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র, মুৎসুদ্দি আমলা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হলেও ভারতীয় জনগণ ও দেশ কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হয় নি অথবা অন্য কোনভাবে সরাসরি উপনিবেশেও পরিণত হয় নি। সুতরাং, মধ্য তিরিশের (১৯৩০) দশকে চীনের পরিস্থিতি, যখন সিপিসি জাপান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল, তার সঙ্গে আমাদের পরিস্থিতির তফাৎ আছে।

প্রশ্ন: *যুক্তফ্রন্ট গঠনের অসুবিধাগুলি পার্টি কী করে সামাল দেবে এবং বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সাথে আজকের প্রেক্ষাপটে পার্টি বিষযগত পরিস্থিতি (subjective condition) নিয়ে কী ভাবছে?*

উত্তর: কমরেড, মাওবাদী পার্টি দেশের জনগণ এবং তাদের বিকাশের কেন্দ্র হতে চায়, তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা ৯৫ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করি। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং জনগণও এমন এক পার্টি কামনা করে যা তাদের আশা পূরণ করবে। বুর্জোয়া ও শোষণভিত্তিক ব্যবস্থায় আমরা আংশিক সংস্কারের জন্য কাজ করছি না। আমরা জনগণের আর্থ-সামাজিক দাবি এবং সমাজের মৌলিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তনের জন্য লড়াই করছি। আমরা যদি মানুষের কাছে পরিষ্কার ব্যাখ্যা রাখতে সফল হই, আমরা যুদ্ধের জন্য তাদের জমায়েত ও সংগঠিত করতেও সফল হবো এবং আমরা জয়লাভ করবো। জনগণের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, গণভিত্তি, ফৌজ ও মুক্তাঞ্চল ছাড়া জনগণ শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট গঠনে সফল হয় নি। বিপ্লবী সংগ্রামের পথে, ফৌজ গঠন এবং ঘাঁটি এলাকা নির্মাণ করে আমরা অনেকগুলি কৌশলগত যুক্তফ্রন্ট এবং এমনকি ক্ষণস্থায়ী রণনীতিগত যুক্তফ্রন্টও গঠন করতে পারি। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জনতাকে সমবেত করার জন্য, নিজস্ব ফৌজ গড়ে তোলার জন্য, স্থায়ী ঘাঁটি নির্মাণের জন্য এবং শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট গঠনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমাদের কঠিন প্রয়াস নিতে হবে।

প্রশ্ন: *মিত্রদের কাছে টানবার রাস্তা ও পদ্ধতি কী?*

উত্তর: ব্যাপকতম ঐক্যের স্বার্থে আমরা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্রদের প্রতি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারি না। এখন শত্রুর বিরুদ্ধে অনেকগুলি শক্তি সমবেত হয়েছে। আমাদের তাদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। যুক্তফ্রন্টে কিছু কিছু বিষয়ে নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতিনিধিরাও থাকবে। তারা আমাদের দলে যোগ দেবে, এ আশা করতে পারি না। ওটা অনেকটা দূরের

বিষয়। এই মুহূর্তে, রণনীতিগত লক্ষ্য পূরণে আমাদের দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা প্রয়োজন এবং সেই কারণে কৌশলগতভাবে আমাদের নমনীয় হওয়া প্রয়োজন।

আরও স্পষ্ট ভাবে বলা যায়, দুই ভিন্ন ধরণের যুক্তফ্রন্ট আছে। প্রথম, জনগণের মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি জনগণ ও শত্রুপক্ষের মধ্যে— শত্রুপক্ষের দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করে তাদের একটি অংশ, গোষ্ঠী, ব্যক্তির সঙ্গে। পার্টিকেই সেটা করতে হবে। কিছু কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে তার সুযোগ আছে। আমরা এটাকে বিপ্লবের পরোক্ষ সংরক্ষিত অংশ বলি এবং খুব সতর্কভাবে এদের ব্যবহার করতে হয়। আমাদের যদি পরিষ্কার ধারণা থাকে যে এরা শ্রেণী-মিত্র নয়, তাহলে আমাদের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ঘটবে না। বিপ্লবের সাফল্যের জন্য আমাদের এই ধরণের যুক্তফ্রন্ট দরকার। সিপিআই এবং সিপিএম-এর মতো ভারতীয় বামপন্থীরা বুর্জোয়াদের অনুসরণ করেছিল। তার ফলে অধঃপতন হয়েছে।

শেষ বিষয় হলো, প্রত্যেক শ্রেণীর নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ এবং একটি বিশ্ববীক্ষা আছে। যুক্তফ্রন্ট এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিবদমান জোট। কিন্তু সব মিলিয়ে, লড়াইটা যদি মূল শত্রুর বিরুদ্ধে হয়, তাহলে এই দ্বন্দ্ব গৌণ হয়ে যায়, ঐক্যই তখন হয় প্রধান। প্রধান বিষয় হলো, কীভাবে এই সংগ্রাম ও ঐক্যের ভারসাম্য রক্ষা করা যায় ও তার কার্যকর ব্যবহার করা যায়। শত্রু শ্রেণী কখনোই জনগণের পাশে দাঁড়াবে না। ক্ষমতা দখলের পরেও সমাজের অভ্যন্তরে সংগ্রাম দীর্ঘদিন চালু থাকে। সুতরাং যুক্তফ্রন্ট এবং শ্রেণীসংগ্রাম একই সাথে চলমান থাকে। এই কারণে জনসাধারণের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমাদের অত্যন্ত জরুরি কর্তব্য। সফলভাবে যদি এটা করতে পারি, আমরা ঐ শ্রেণীকেও কাছে টানতে পারবো এবং আমাদের দলে যোগদানের অনুমতি দিতে পারি। ...চীনের এবং নেপালের পার্টি এই কাজটা করার ফলে লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কর্মী, সাথে সাথে ফৌজের এরকম আদর্শগত ও রাজনৈতিক বিস্তৃতি ঘটতে পারে। যুক্তফ্রন্টে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক সংগ্রামের এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক যদি ঠিকমতো চালনা করা যায়, আমরা শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে এবং মূল শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হবো।

একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে মার্কসবাদের ঐতিহাসিক শিক্ষার ভিত্তিতে মতাদর্শগতভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব দূর করা সম্ভব। এটা করতে পারলে আমরা জনগণকে আমাদের দিকে টেনে আনতে পারবো, এবং এমনকি তাদের মার্কসবাদী মতাদর্শের সাহায্যে তাদের বিশ্ববীক্ষা পরিবর্তিত করে তাদের রূপান্তর ঘটাতে পারবো।

যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কিত মৌলিক ভাবনা আমরা আলোচনা করলাম। বিষয়গত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী এবং গণতান্ত্রিক মানুষ জনগণের সাথে অনুকূল মৈত্রীতে আবদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে এটাকে ফলপ্রসূ করতে হবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কঠোর দমন-পীড়নের মুখে দাঁড়িয়ে কীভাবে এসব অর্জন করা যাবে?

আমরা স্বীকার করি যে আমরা এখনও ছোটো পার্টি। কিন্তু আমাদের প্রকৃত শক্তি মার্কসবাদের আদর্শের মধ্যে, শ্রেণী প্রতিনিধিত্বে এবং নীতি ও পন্থার মধ্যে নিহিত। যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রক্রিয়া কী? মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, ভূস্বামী ও সাম্রাজ্যবাদ মূল শত্রু, যার বিরুদ্ধে বিশাল জনসমষ্টিকে গণ লাইন ও শ্রেণী লাইনের সাহায্যে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন। যদি জনগণের স্বার্থ বজায় রেখে চলি এবং সঠিকভাবে গণ লাইন ও শ্রেণীলাইন অনুসরণ করতে পারি, আমরা নিশ্চয়ই সফল হবো এবং একটি ছোটো শক্তি থেকে বড়ো শক্তিতে পরিণত হবো।

***প্রশ্ন**: কিন্তু বাস্তবে আপনারা সেটা কীভাবে করেন?*

উত্তর: যখন আমরা সংখ্যায় কম ছিলাম তখনও আমাদের কীরকম শক্তি ছিল সে কথা আমি আগেই বলেছি। আমাদের মূল শক্তি কোথায় সে কথা আমি বলেছি। কিন্তু লড়াই করার জন্য জাগতিক (physical) শক্তি লাগে। আমাদের দরকার শক্তিশালী ফৌজ ও শক্তিশালী গণভিত্তি, এবং তার সাথে শক্তিশালী পার্টি। এটা লাগবেই। এটা না থাকলে মতাদর্শগতভাবে আমরা যতই শক্তিশালী হই না কেন, পরাজয় ঘটবে। তাই, আমাদের এগোতে হবে। এর জন্য, শত্রুর নিপীড়ন চলাকালীন আমাদের সঠিক রণকৌশল নিতে হবে। আমাদের ধারণা অনুসারে, শত্রুপক্ষ পুরোপুরি যুদ্ধের পথে যাবে। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের জন্যই একটা ফাঁদ রচনা করে ফেলবে। আমরা যদি সেটা বুঝতে পারি এবং আমাদের গেরিলা যুদ্ধকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারি, আমরা সফল হবো।

বাস্তব দিক দিয়ে দুটো ব্যাপার আছে। প্রথমত, শাসক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। সমাজে পুরনো দ্বন্দ্বগুলি রয়েছে এবং শাসক শ্রেণীগুলির নিজেদের মধ্যে নতুন নানা দ্বন্দ্ব তৈরি হবে— সেই দ্বন্দ্বগুলিকে জনগণের স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে। শুধু শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করা ও তাৎক্ষণিক সুবিধার জন্যই নয়, দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী প্রয়োজনেও এটা (করা) দরকার। আমাদের উচিত আমাদের গণভিত্তিকে ও ফ্রন্টগুলোকে আরো জোরদার করা— এগুলি আমাদের ক্ষমতার ঢাল। কমরেড মাও বলেছেন যে ফৌজ ও লড়াই গড়ে তুলতে জনগণই নির্ধারক। আমাদের অবশ্যই বিশাল সংখ্যক জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে নামাতে হবে, শত্রুদের ভেতরকার দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে শত্রুদের একের পর এক ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অন্ধ্রে গেরিলা যুদ্ধ করার সময় আমরা একটা ধাক্কা খাই। কিন্তু আমরা যুদ্ধ একেবারে ছেড়ে দিইনি। তবে পিছু হটেছি। গোদাবরী উপত্যকা (অন্ধ্রপ্রদেশে) থেকে মহারাষ্ট্র,

Second Time

ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খন্ড হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধকে আরো জোরদার করেছি, তাকে বিস্তৃত করেছি। আমাদের বাহিনী নিশ্চই শত্রুর প্রতিরোধ করবে, কিন্তু সেটা হবে বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে আমাদের সুবিধামত। এখন আমাদের মূলত বুদ্ধি করে আঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার কৌশল নিতে হবে। গেরিলা যুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকশিত করতে হবে, গেরিলা বাহিনীকে বিকশিত করতে হবে নিয়মিত বাহিনীতে। জনগণের উৎসাহের সাথে যোগদান প্রয়োজন। আমাদের শক্তি নিহিত জনগণের মধ্যে। শত্রু চাইবে আমাদের শুধু সশস্ত্র সংঘর্ষে সীমাবদ্ধ রাখতে। তারা চায় আমাদের একটা সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে আটকে রাখতে। আমাদের এলাকাকে তারা বিভিন্ন খণ্ডে ভাগ করে ফেলছে, আমাদের ঘিরে ফেলছে। কিন্তু জনগণকে সংগঠিত করে আমরাও ওদের ঘাঁটিগুলিকে মৌমাছির মতো তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। শত্রুর শিবিরগুলি যেসব অঞ্চলে অবস্থিত সেসব অঞ্চলে, এমন কি সেই গ্রামের মধ্যেও, আমাদের বিপ্লবী জনগণের কমিটি আছে— সেখানে এখনও কাজ চলছে। শিবিরগুলোতে অবস্থিত সুরক্ষা বাহিনীগুলির জ্ঞাতসারেই শয়ে শয়ে লোক পুকুর খোঁড়ার কাজ করছেন। শত্রু যেমন আমাদের জনগণকে ভাগ করে দিচ্ছে, আমরাও তেমনি আমাদের ভিত্তি প্রসারিত করার চেষ্টা করছি, চেষ্টা করছি শত্রুর শিবির/ঘাঁটিগুলিকে ঘিরে ফেলতে। গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশলগত গুরুত্ব মনে রাখতে হবে। ওরা এক লক্ষ সেনা নিয়ে আসছে। ওরা ঠিক করেছে, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে রাষ্ট্রীয় রাইফেলস (ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ বিদ্রোহ-দমন বাহিনী) নিয়ে আসবে, তাদের কাজে লাগাবে। কিন্তু লালগড় থেকে সুরজগড় মানে কোটি কোটি মানুষ। আমরা যদি শত্রুর বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করার কাজে সফল হই, তাহলে এই লড়াইকেই আমরা বিপ্লবী পরিবর্তনের একটা ভিত্তি হিসাবে গড়ে তুলতে পারবো। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে দেখলে একটা সুবিধা আছে, যেটা খুব তাড়াতাড়ি অর্জন করা যাবে না। শত্রু যেমন চাইছে খুব তাড়াতাড়ি এটা শেষ করতে, তার বিপরীতে আমরা এই যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে চাই, অবস্থাটাকে আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক জায়গায়, বিপ্লবের পক্ষে, নিয়ে আসতে চাই।

ওরা চাইছে আমাদের এলাকাকে ছোট করে আনতে, আর আমরা চাইছে আরও প্রসারিত করতে। তথাকথিত সমাজ-বিরোধীদের রুখতে ওরা গ্রাম সুরক্ষা সমিতি গড়তে চাইছে এবং এভাবে আমাদের আটকে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু জনগণ আমাদের আহ্বান করছেন। এখনই তো, কম অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন সব কমরেড, তাঁদের হাতে অস্ত্রও না থাকার মতো, জনগণ এঁদের নিজেদের এলাকায় আসতে বলছেন। উদাহরণ-স্বরূপ, ওড়িশার সোনভদ্রতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই আমাদের ডেকেছেন। তাছাড়া নয়াগড় হামলা যার অংশ, আমাদের পরিকল্পিত সেই অপারেশন রোপওয়ে-র মাধ্যমে গত মাত্র ৮-১০ মাসের মধ্যে আমরা রায়গড় থেকে নয়াগড় অবধি ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নয়াগড় হামলার শুধু রণনৈতিক গুরুত্বই নেই, রাজনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে, কারণ এই হামলার পেছনে রণনৈতিক কারণ রয়েছে। তারপর সমতলে মানপুর এলাকায় (ছত্তিশগড়) ছড়িয়ে পড়ার জন্য অপারেশন বিকাশ হাতে নেওয়া হলো। জনগণ আমাদের ডাকছেন, তাঁদের মনোবল জোরালো। আমরা যদি এভাবে ছড়িয়ে পড়ি, তাহলে আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাব, গেরিলা যুদ্ধকে আরো প্রসারিত করব। আমরা যদি এভাবে এগিয়ে যাই এবং লড়াইকে আরো দীর্ঘায়িত করতে সফল হই, দীর্ঘকালীন বিচারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে বাধ্য, এবং চাপে রাষ্ট্র ভেঙে পড়বে। বর্তমানে রাষ্ট্র ইচ্ছামতো সামরিক খরচ করছে, কিন্তু লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হলে, নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে, ওরা যতই খরচ বাড়াক না কেন, দীর্ঘকালীন বিচারে তা ব্যর্থ হবে। এই রণনৈতিক পরিকল্পনা অনুসারে আমরা আমাদের যুদ্ধ লড়ছি।

এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটা নিয়ে আমি আগেই, প্রথম প্রশ্নের উত্তরে, ব্যাখ্যা করেছি।

প্রশ্ন: *এই অবস্থায় পার্টির পক্ষে কি যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্র হওয়া সম্ভব? যেমন ধরা যাক, দিল্লীতে, যেখানে পার্টি দুর্বল, সেখানে যুক্তফ্রন্ট কেমন হতে পারে বলে পার্টি মনে করে?*

উত্তর: পার্টিকে যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রে রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি ইতিমধ্যেই এই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর দিয়েছি।

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরে বলি, দিল্লীতে যদি তা করতে পারেন, তাহলে কাজ করা সহজ হবে। কিন্তু আজ অবস্থা সেরকম নয়। তাই, অবস্থার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সম্ভাব্য অন্য নানান ভাবে পার্টিকে কেন্দ্রে রাখা হবে। অন্য অনেক উপায় আছে— অন্যান্য মাওবাদী শক্তিগুলির মধ্য দিয়ে, গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিগুলির মাধ্যমে। তাই, দিল্লীর মতো জায়গায়, যেখানে পার্টির প্রত্যক্ষ সুযোগ কম, সেখানে আমাদের অন্য ভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের ফৌজের এ ব্যাপারটা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, যুক্তফ্রন্টের জন্য পারদর্শী ফৌজের [ওখানে] নিয়োগ করতে হবে, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শক্তিকে চিহ্নিত করতে হবে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় একটা মিলিত বোঝাপড়া গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও মাওবাদী শক্তিগুলিকে একত্রিত করা দরকার, আর মধ্যবর্তী

Second Time

সময়টায় তাদের দিয়েই নেতৃত্ব দেওয়াতে হবে।

প্রশ্ন: *লালগড় আন্দোলনের প্রথম দিকে অবস্থা এরকম ছিল যে বড় সংখ্যায় বুদ্ধিজীবীরা লালগড় আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে, দৃষ্টি সরে যাচ্ছে ইউএপিএ-র মতো আইনের বিরোধিতা বা এ ধরনের বিষয়ের দিকে। অবস্থাটাকে আপনারা কীভাবে দেখছেন?*

উত্তর: রাজ্য কমিটির সাম্প্রতিক রিপোর্টটা হাতে থাকলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সুবিধা হতো। তবে আমি বলব যে, প্রথম দিকে শহরের বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে অনেকটা সমর্থন পাওয়া গেছে। এখন, শত্রুর আক্রমণ ও সংগ্রামের ধরনের ওপর নির্ভর করে সমর্থনভিত্তি অনেকটাই পাল্টে যাবে। কেউ কেউ লালগড় আন্দোলনের বিপরীত দিকেও চলে যেতে পারেন। বাংলায় নাগরিক অধিকার আন্দোলনে ও শহরাঞ্চলে আমাদের প্রভাব তেমন জোরালো নয়। এর বিকাশ ঘটানোর জন্য আরো অনেক কিছু করতে হবে। শহরাঞ্চলে আমাদের কাজকে আরো জোরদার করতে হবে। অনেকটাই নির্ভর করবে ওখানে আমাদের কাজের ওপর, লালগড় আন্দোলন উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ওপর। বুনিয়াদী জনগণের মধ্যে কাজ করা আর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কাজ করার মধ্যে অনেক ফারাক আছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনেক জটিল ব্যাপার আছে। এই প্রসঙ্গে বলি, বুদ্ধিজীবীরা যদি কোনও একটা বিষয় নিয়ে, এমনকি ইউএপিএ নিয়ে, ঐক্যবদ্ধ হন, যা বৃহত্তর সংগ্রামের বিরোধী নয়, সেটা আমাদের পক্ষে ভালো। হিংসাত্মক পর্যায়ে যারা সরাসরি সমর্থন করতে পারেন না, এই ধরনের অন্যান্য পর্যায়ে তাঁরা একজোট হতে পারেন। তাই, দাবিগুলো পাল্টে যেতে পারে, কিন্তু জনগণের শ্লোগান হতে হবে। আর, লালগড় ও নতুন শ্লোগানের মধ্যে সাযুজ্য আনতে হবে। আমি বলব যে পার্টি নিশ্চয়ই সব ধরনের মানুষের থেকে, এমন কি যারা আমাদের মূল লাইনের সঙ্গে একমত নন কিন্তু জনগণের পক্ষে দাঁড়ান তাঁদের কাছ থেকেও, গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করবে। আমাদের ভুলগুলিকে ঠিক করা ও পার্টিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সমালোচনাকে আমরা স্বাগত জানাই। ইউএপিএ বিরোধী আন্দোলন মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি হিসাবে জনগণের স্বার্থে কাজে লাগবেই। আর সাধারণ ভাবে, এই ক্ষেত্রে যে কোনো জমায়েতই দীর্ঘমেয়াদি বিচারে পার্টির স্বার্থের পরিপন্থী নয়।

প্রশ্ন: *পার্টির কাজের মধ্যে গণতন্ত্রকে— অর্থাৎ ধর্মঘটের অধিকার, বিক্ষোভ প্রকাশের অধিকার ও মতামত প্রকাশের অধিকারকে— আপনারা কোথায় স্থান দেন?*

উত্তর: এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন; তবে এ ব্যাপারে আমাদের পার্টিতে কোনো ধোঁয়াশা নেই। আমরা একটা নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই, যাতে মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, জমিদাররা ও সাম্রাজ্যবাদীদের সবার সত্যিকারের বা বাস্তব স্বাধীনতা থাকবে। জনগণের শত্রু ছাড়া সবার জন্য সত্যিকারের স্বাধীনতা থাকবে। তা ছাড়া, আমি বলবো যে, বিপ্লবী জনগণের কমিটি (আরপিসি) বা জনতা সরকার গড়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় আমরা ঐতিহাসিক তেলেঙ্গানা সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের গ্রাম রাজ্য-র অভিজ্ঞতা, চীনের সোভিয়েতগুলির নীতি কর্মসূচি, ফিলিপিনসের জনগণের বারিও কমিটিগুলি, পেরুর বিপ্লবী জনগণের কমিটি, নেপালের যুক্ত বিপ্লবী গণ কাউন্সিলগুলি সম্পর্কে পঠনপাঠন করেছি, পঠনপাঠন করেছি মহান সর্বহারা সাংস্কৃতি বিপ্লব নিয়েও। তার ভিত্তিতে আমরা ভোটারদের নির্বাচিত সদস্যদের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার সহ সমস্ত মৌলিক অধিকার রেখেছি। এমনকি কর্তৃপক্ষে থাকা যে কোনো ব্যক্তি যদি জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে, আদালতে তাকে সোপর্দ করার অধিকার আছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় চেয়ারম্যান মাও যে চারটি মহান স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে দেয়ালে বড়ো হরফের পোস্টার লেখা ছাড়া প্রতিটি স্বাধীনতার অঙ্গীকার করেছে আরপিসি/জনতা সরকারগুলি। জনতা সরকারগুলির আরো বিকাশ ঘটলে বড়ো হরফের পোস্টার স্বাধীনতাও দেওয়া হবে। সংবিধান অনুসারে, রাজনৈতিক বিরোধিতার জন্য কোনো শারীরিক শাস্তি দেওয়া যাবে না। প্রত্যেকের রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার রয়েছে, রয়েছে ইউনিয়ন গঠনের অধিকারও। ভারত সরকার বিক্ষোভ দমন করার চেষ্টা করছে, তাই জনগণ বিপ্লব চাইছেন। আমরা সেই একই ভুল করতে পারি না। তাছাড়া, আদালতে অভিযোগ প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো ভুল হলে সেই ব্যক্তি গ্রামের বিপ্লবী জনগণের কমিটির কাছে, তার উপরের স্তরে, এমনকি পার্টির কাছেও, আপিল করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, নতুন এলাকার এক জায়গায় একটি ঘটনায় দুটি গ্রামের ৩৩ জন সদস্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে যোগসাজসে শত্রুর চর হয়ে যায়। আমাদের কমরেডরা সেখানে গিয়ে এ নিয়ে ব্যবস্থা নেন। গ্রামবাসীরা প্রধান চরটিকে প্রাণদণ্ড দিতে চাইছিলেন। পার্টি সেখানে হস্তক্ষেপ করে সেই লোকটিকে ভুল বোঝার একটি সুযোগ দেয়।

প্রশ্ন: *যুক্তফ্রন্টে প্রত্যেকে যোগ নাও দিতে পারে। কিছু কিছু মাওবাদী গোষ্ঠী ও গণতান্ত্রিক সংগঠন বাইরেও থেকে যেতে পারে। সে ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা কী করবেন?*

উত্তর: যারা বিরোধিতা করবেন তারা জনগণের শত্রু; শোষিত জনগণের ৯৫ শতাংশের বেশি তাদের বিরোধিতা করবেন। কিন্তু ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে ৫ শতাংশও একটা বিশাল সংখ্যা।

Second Time

আমাদের পার্টি বিশ্বাস করে যে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মধ্যে তারা প্রত্যক্ষভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে শত্রুর রাজনৈতিক ক্ষমতা ধ্বংস করার সুযোগ পাবেন। অনেককে নিজেকে রূপান্তরে সাহায্য করা হবে। চীনে মাদাম সান ইয়াৎ সেন শেষ দিন পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন, যদিও কোনো দিনই তিনি পার্টি সদস্য ছিলেন না। যতদিন তাঁরা জনগণের সেবা করবেন, জনগণের সমর্থন পাবেন, ততদিনই তাঁরা থাকতে পারেন। যখন সামাজিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে তাঁরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বেন, তখন তাঁরা এমনিতেই উবে যাবেন। জনগণ যদি তাঁদের পার্টিকে সমর্থন করেন তাহলে তাঁরা নির্বাচনেও জিততে পারেন। আরপিসি নিয়ে আমাদের নীতি-কর্মসূচিতেও আছে যে ভোটার হলে অন্য পার্টি বা সংগঠনের লোকেরাও আরপিসি-তে যোগ দিতে পারেন, আরপিসি-তে নির্বাচিত হওয়ার অধিকারও তাঁদের আছে। আমাদের ধারণা যেহেতু এইরকম, বাস্তবেও সে রকমটাই করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের আরও বিকাশ লাভ করতে হবে। নেপাল এ বিষয়ে অনেকটা এগিয়েছে।

ছোট ও মধ্য মাপের বুর্জোয়াদের আমরা কিছু কিছু বিধিনিষেধ সমেত বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিই— বিধিনিষেধ এই জন্য যাতে তারা জনবিরোধী হয়ে উঠতে না পারে, যাতে কালোবাজারি, মজুতদারি, ফাটকাবাজি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ার বড়ো পুঁজি আর বিদেশি পুঁজিকেই শুধু আমরা বাধা দিই। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৮-৯৯ সালে সরকার যখন ছোট ব্যবসায়ীদের বনজ সম্পদ নিয়ে কাজকারবার বন্ধ করে দিল, তাতে কিরজারা (স্থানীয় ব্যবসায়ী) প্রতিবাদ করে, আর আমরা তাদের জন্য আন্দোলন করি; মহাজনি বন্ধ করে দিলেও, লাগামছাড়া শোষণে রাশ পড়ালেও বাইরে থেকে জিনিসপত্র আসা আমরা বন্ধ করি নি। এটা এক ধরনের পুঁজিবাদী বিকাশ। কিন্তু আমরা একে নিয়ন্ত্রণে রাখছি। জনগণের অর্থনীতির বিকাশের জন্য এটা দরকার। ব্যবসায়ীরা সহযোগিতা না করলে, আমরা কীভাবে টিকে থাকতাম? জনতা সরকারের অধীনে বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর এই ছোট ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে বাইরের বুর্জোয়ারা সুযোগ নিতে না পারে। তাহলে, দালালরা ওদের নিজেদের দিকে টানতে চেষ্টা করলেও পূর্ণ স্বাধীনতা থাকছে। শুধুমাত্র বাঁচা-মরার প্রশ্ন এলে তবেই শারীরিক শাস্তির অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এখন, নিপীড়ন ও যুদ্ধের মুখে, আমরা একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি সেটা স্বীকার করতেই হবে।

প্রশ্ন: *আলাপ-আলোচনা নিয়ে আপনাদের পার্টির বক্তব্য কী?*

উত্তর: সাধারণভাবে জনগণ ও মাওবাদী বিপ্লবীরা হিংসা বা কারোর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ চান না। শুধুমাত্র অনিবার্য পরিস্থিতিতেই তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তাদের শত্রুদের প্রতিরোধ করে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। তাই, আমরা একে দেখবো আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ হিসাবে। পুরোপুরি যুদ্ধের এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেখতে হবে যে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যটিতে ১.৩ লক্ষ সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে, ছত্তিশগড়ে রয়েছে ৪৫ হাজার (শীঘ্রই এই সংখ্যাটা আরও ২০ হাজার বাড়বে), মহারাষ্ট্রে মোতায়েন রয়েছে ১.৬ লক্ষ। এই রাজ্যগুলির প্রতিটিতে যে পুলিশ বাহিনী রয়েছে তা ইউরোপের অনেক দেশের চাইতে বেশি। অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও ভয়ানক বিশেষ সব বাহিনীকে প্রশিক্ষিত করছে রাষ্ট্র, পাশাপাশি রয়েছে জনবিরোধী সব ভয়ানক ভয়ানক আইন। বাংলা, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, ও তার পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে মোতায়েন আছে ৮ থেকে ৯ লক্ষ পুলিশ। তার মধ্যে ২.৫ থেকে ৩ লক্ষ পুলিশ সরাসরি জনগণের বিরুদ্ধে নিয়োজিত। পাশাপাশি এই অঞ্চলে নিয়োজিত আছে ১ লক্ষ কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর লোক।

এখানে জনগণ উত্তর-পূর্ব ভারত ও জম্মু-কাশ্মীরের চেয়ে শক্তিশালী বাহিনীর মোকাবিলা করছে। জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করতে ও এখানকার খনিজ চুরি করার জন্য চলছে একটি নিষ্ঠুর ও হিংস্র দমন অভিযান।

সম্ভব হলে, এই বিষয়ে আমরা খানিক স্বস্তির আশা রাখি।

এই স্বস্তির সময়কাল যত লম্বা হবে জনগণের পক্ষে ততই ভালো। গণতান্ত্রিক কাজের জন্য এটা দরকার। কিন্তু সরকার একহাতে অটোমেটিক বন্দুক ধরে থাকবে, এভাবে কথা বলা যায় না। লোকেরা লড়াই চালিয়ে যাবে। তাদের ওপর গুলি চালাতে থাকলে লোকে অস্ত্র ছাড়বে না, আত্মসমর্পণ করবে না। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির জারি করা জনগণের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়া উচিত। আলাপ আলোচনার জন্য পার্টি প্রধান যে দাবিগুলি সরকারের সামনে রেখেছে সেগুলি সংক্ষেপে এইরকম: (১) এই প্রত্যক্ষ লড়াই বন্ধ করতে হবে; (২) কোনোরকম গণতান্ত্রিক কাজকর্ম শুরু করতে হলে, পার্টি ও গণসংগঠনগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে; (৩) কমরেডদের বেআইনি আটক ও অত্যাচার বন্ধ করতে হবে, অবিলম্বে তাদের মুক্তি দিতে হবে। এই দাবিগুলি মেনে নিলে জেলে থেকে ছাড়া পাওয়া নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ নেতৃত্ব হাতে নিয়ে আলাপ-আলোচনায় পার্টির হয়ে কথা বলবে।

আমাদের পার্টির বিকাশ নিয়ে দু-চার কথা

১৯৮০-র দশকে জাঁ মিরডাল যখন *ইন্ডিয়া ওয়েটস* বইটি লিখেছিলেন, তখন তিনি আন্দোলন সম্পর্কে যেসব কথা বলেছিলেন তার পর থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক দুই ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দিকে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সেই সময়ের পরে একটি

Second Time

পরিপ্রেক্ষিতের *বিকাশ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে।* ভারতের বিশেষ অবস্থাকে হিসাবে নিতে শুরু করেছি আমরা। কমরেড চারু মজুমদারের সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নেতা ছিলেন খুব কম জন। অনেকে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন, *অনেকে হয়েছেন* বামপন্থী *বিচ্যুতির*। মাত্র কয়েকজনই *মাত্র এখন আছেন।* ফলে এটা এক নতুন এক প্রজন্ম, নতুন যুবকেরা, *তাদেরকে* অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্যাডারে পরিণত করতে হলে অনেক সময় *লাগবে।* জান মিরডাল, আপনি যখন ১৯৮০ সালে এখানে এসেছিলেন, পার্টি তখন এই সমস্যায় ভুগছিল। তার ৬-৭ বছর পর জনযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকমতো নেতৃত্ব তৈরি *হয়েছে।* ১৯৮০ সালে জান মিরডাল যখন অন্ধ্রপ্রদেশে আসেন তখন শুধু সেই রাজ্যে রাজ্য কমিটি ছিল, আর ছিল তামিলনাড়ু রাজ্য কমিটি। একটা কেন্দ্রীয় কমিটিও ছিল, কিন্তু মাত্র দুটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সেই কেন্দ্রীয় কমিটির করার তেমন কিছু ছিল না। এমসিসি তখন কাজ করছিল পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে, যদিও বাংলায় তারা ছিল নেহাত দুর্বল। একই ভাবে জনযুদ্ধ কাজ করছিল অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে, কিন্তু তামিলনাড়ুতে তারা ছিল খুব দুর্বল। পেছন ফিরে দেখলে এই দুই কেন্দ্রের অবস্থা ছিল এই রকম। মহারাষ্ট্রে পরে কমরেড কোবাড গান্ধী ও অন্য কয়েকজন কমরেড জনযুদ্ধে যোগ দেন। এমসিসি-তে কমরেড কেসি কিছু কাজকর্ম শুরু করেন, তিনি আসামেও কাজ শুরু করেন, কিন্তু তা ছিল সামান্যই। এখন ২০টি রাজ্যে আমাদের উপস্থিতি রয়েছে, যদিও কিছু কিছু এলাকায় পার্টি খুব দুর্বল। তাই বলা যায় যে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের কালে বিকাশ অসম। আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলনের স্তর বিভিন্ন। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেখতে হবে যে একটি বিপ্লবী পার্টির বিকাশ ও তার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি তো তাই বলব।

কমরেডগণ, ১৯৮০ সালে পার্টি পিছু হটা থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছিল। নতুন করে সংগঠিত হতে, সংহত হতে চেষ্টা করছিল। একদিকে ছিল সংকীর্ণতাবাদের সমস্যা, অন্যদিকে গণভিত্তি বেশির ভাগটাই হারিয়ে গিয়েছিল। তাই গণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে ও সামরিক ক্ষেত্রে সবটাই আমাদের নতুন করে গড়ে তুলতে হয়েছে। সেইমতো আমাদের কৌশলেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। সে সময় করা হচ্ছিল মূলত সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রচার আন্দোলন। রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব তৈরি করার জন্য ও শহরাঞ্চলে খোলাখুলি আন্দোলন শুরু করার জন্য করা হচ্ছিল এগুলি।

আগে, কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে গণ সংগঠনকে অগ্রাহ্য করার লাইন নেওয়া হয়েছিল। পরে আমরা নতুন করে ভাবনা চিন্তা করি এবং তীব্র আত্মসমালোচনার একটা পর্বের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর আমরা মেনে নিই যে আগে কিছু কিছু ভুল হয়েছিল, আর তার ভিত্তিতে এগোনোর জন্য আমরা সেই সংগ্রাম নতুন করে গড়ে তুলি। আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করা হয় ১৯৭৪ সালে, আর ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে পার্টির সবাই বিষয়টি সম্পর্কে একমত হন। আর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে পার্টির অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য কনফারেন্সে এটি আবার গৃহীত হয়; তার পর সূত্রপাত হলো নতুন ধরনের প্রয়োগের।

প্রথমত, কোনো বিপ্লবী পার্টির একটি নেতৃত্ব দরকার, যে নেতৃত্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বুঝবে, পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝে সে অনুযায়ী রণকৌশল ঠিক করবে। যেসব বিষয়ের কথা আমি বলেছি, ৮০-র দশকের পরবর্তী কালে, আমরা যদি এই সব অভিজ্ঞতা যোগ করি, আমরা দেখব যে পরবর্তী বছরগুলিতে আমাদের জানা-বোঝার ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা বিকাশ ঘটিয়েছি।

দ্বিতীয়ত, একটি বিপ্লবী পার্টি জনগণকে সংগঠিত করবে, শ্রেণী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে। রণনীতির দিক থেকে পরিকল্পনা তৈরি করা হলো, স্থান বাছা হলো এবং ১৯৮০-র দশক থেকে কিছু কিছু বিকাশ ঘটল— জনগণ পার্টির নেতৃত্বে সংগ্রাম শুরু করলেন, যেটা একটা বড়ো পরিবর্তন, বড়ো বিকাশ।

তৃতীয়ত, একটি বিপ্লবী পার্টির পক্ষে সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সি পি রেড্ডি গোষ্ঠী, নামে সিপিআই(এম-এল), সত্যনারায়ণ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন প্রভিশনাল কেন্দ্রীয় কমিটির অংশ— আপনি যখন এসেছিলেন তখন তাদেরই শুধু গোদাবরী অঞ্চলে কিছু স্কোয়াড ছিল। জনযুদ্ধ তখন কৃষক স্কোয়াড রূপে কিছু সশস্ত্র স্কোয়াড গড়তে শুরু করেছে মাত্র, আর ওদের তখন সশস্ত্র ক্যাডারের সংখ্যা ৬০-৭০।

পরে আমরা এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলের ধারণা অনুযায়ী, গণ ফৌজ গড়ে তোলার জন্য শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশ ঘটালাম; এখানে জনযুদ্ধ ও ওখানে এমসিসি ৫,৭,৯,১১ জনের সশস্ত্র গেরিলা স্কোয়াড গড়ে তুলতে শুরু করল। কয়েকটি প্লাটুন গড়ে তোলা হলো, গেরিলা এলাকা দেখা দিল। ২০০৪ সালে সংযুক্তির ঠিক আগে আগে কয়েকটি এলাকায় কম্পানিও তৈরি হয়ে গেছে। পূর্বতন জনযুদ্ধের আছে গণ গেরিলা বাহিনী, আর এমসিসি-র আছে গণ মুক্তি গেরিলা বাহিনী। সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় আমরা সিপিআই(মাওবাদী)র অধীনে গণ মুক্তি গেরিলা বাহিনী প্রতিষ্ঠা করলাম। পরবর্তী স্তর হলো ব্যাটালিয়ান গড়ে গণ মুক্তি ফৌজ তৈরির দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই মূল ধারণাগুলির ওপর ভিত্তি করে আমরা রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্চতর ধাপগুলিতে এগিয়ে যাই। ’৮০ দশকের আগেও এই ভাবনা ছিল। কিন্তু কেবল সংযুক্তির পরেই একে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়।

আমি আর দুটো বিকাশের কথা বলবো। একটি পার্টি বাস্তবে

Second Time

যখন তার বিশাল সংখ্যক সদস্যদের নিয়ে নীতি বা রণকৌশল তৈরি করার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে, একই সাথে পার্টিটি কিন্তু হাজার হাজার লাখ লাখ লোককে নিয়ে প্রয়োগের মধ্যে আছে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হলে এবং ভুলগুলিকে ঠিক করতে গিয়ে (পার্টির) ভেতরে ও বাইরে তিক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই তিক্ত মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবল আমরা আজকের অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছি। '৭০-এর দশকের শুদ্ধিকরণ ও রিভিউয়ের পর 'জনযুদ্ধ' তৈরি হয়েছিল। তাদের ভয়ানক ধরনের অন্তঃপার্টি সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল: প্রথমত, সংকীর্ণতাবাদ ও গোঁড়ামিবাদ; দ্বিতীয়ত, '৯০-এর দশকের গোড়ায় কমরেড কোন্দাপল্লী সীতারামাইয়ার নেতৃত্বের সমস্যা। তারপর আবার এমসিসি ও জনযুদ্ধের মধ্যে সংঘর্ষ ছিলো তিক্ত এমন এক অভিজ্ঞতা, ইতিহাসে এমন এক কালো সময়, যা ভোলা যায় না। মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পার্টি রণকৌশলগতভাবে দুটি পথ গ্রহণ করলো। আলাপ-আলোচনা, পর্যালোচনা এবং সংগ্রাম। এই তিনটি সময়েই পার্টি সাফল্যের সঙ্গে সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছে। এমসিসিও একই ভাবে তাদের ভিতরকার সংকট কাটিয়ে উঠেছে। তাদের একটা অংশ তখনও লড়াই চালিয়ে যেতে চাইছিল, মাওবাদ নিয়ে ও সংকীর্ণতাবাদ নিয়ে মতপার্থক্যও ছিল। সাফল্যের সঙ্গে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা গেছে। যেসব শক্তি দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ ও কৃষি বিপ্লব মানে না তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছে পার্টি ইউনিটিও। এমনকি এই স্তরেও জনযুদ্ধ ও এমসিসি-র সদস্যসংখ্যা কমতে থাকে, অন্যদিকে বিনোদ মিশ্র ও সত্যনারায়ণ সিংহের গোষ্ঠী শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠতে থাকে। বিনোদ মিশ্ররা বাম সুবিধাবাদের দিকে চলে যায়, আর সত্যনারায়ণ সিংহরা যায় দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের দিকে। আর প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা বারবার ভাঙনের মুখে পরে, শেষপর্যন্ত তারা প্রায় শেষ হয়ে যায়—আজ তাদের উপস্থিতি সামান্যই।

আগে, সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি আমাদের সামনে আর একটা সমস্যা ছিল এই যে, আমাদের যে লাইন তাতে শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার কথাই বলা হয়েছিল; অন্য প্রশ্নগুলি যেমন, জাতীয়তার প্রশ্ন, নারী প্রশ্ন, দলিত প্রশ্ন ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রশ্নে মনে করা হতো যে (মূল প্রশ্নটির সমাধান হলে) আপনাআপনিই সেগুলির সমাধান হয়ে যাবে। পরে আমরা আমাদের এই অবস্থানটা শুধরে নিয়েছি; তাৎক্ষণিক শ্লোগান ও চূড়ান্ত (আলটিমেট) শ্লোগান দুটোকে একসাথে মিলিয়েছি। নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের জন্য ও সেদিকে এগোনোর জন্য এটা অত্যাবশ্যক। অন্য এম-এল গোষ্ঠীগুলি শুধু তাৎক্ষণিক শ্লোগান তুলছে আর তার ফলে সংস্কারবাদের কবলে পড়ছে, আমরা আবার অনেক দিন শুধু চূড়ান্ত শ্লোগান তুলতাম। কিন্তু এখন, তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্ত, দু ধরনের শ্লোগানই সামনে রাখায় আমরা আরও ভালোভাবে এগোতে পারছি।

পার্টি-শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে, রাজ্য স্তরে ও জেলা স্তরে অনেকগুলো পার্টি পত্রিকা আছে। এদের মধ্যে খান পঁচিশ পার্টির পত্রিকা। অনেকগুলি পত্রিকা গণসংগঠনগুলির। কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা পিপলস ওয়ার/লাল পতাকা প্রকাশ করি। এটি মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক পত্রিকা। একই সাথে ইংরাজি, হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয় একটি সামরিক পত্রিকা—আওয়ামি জুঙ্গ। ইংরাজিতে প্রকাশিত হয় মাওইস্ট ইনফর্মেশন বুলেটিন। এই পত্রিকাগুলি প্রকাশ করি আমরা দণ্ডকারণ্য: (১) প্রভাত (হিন্দী, পার্টির রাজনৈতিক পত্রিকা), (২) বিযুক্কা (মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক পত্রিকা, গোন্দ/ *কোয়াম*? ভাষায়), (৩) পাদিয়োরা পোল্লো (সামরিক পত্রিকা, গোন্দ/কোয়াম ভাষায়), (৪) সংঘর্ষরত মহিলা (KAMS পত্রিকা, হিন্দী), (৫) ঝংকার (সাহিত্য সংস্কৃতির পত্রিকা, বিভিন্ন ভাষায়)। বিভাগ/জেলা স্তরে গোন্দ/কোয়াম ভাষায় : দক্ষিণ বস্তার: পিটুরি (বিদ্রোহ); দক্ষিণ বস্তার: মিদাঙ্গুর (অগ্নিকুণ্ড) ; দর্ভ বিভাগ : ময়িল গুদরুম (বজ্র); উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগ, গজিচিরোলি : পোদ্দু (সূর্য); মাদ ও দক্ষিণ বস্তার যুগ্ম বিভাগ: ভূমকাল (ভূমিকম্প); পূর্ব বস্তার বিভাগ: ভূমকাল সন্দেশ (বিদ্রোহ বার্তা)। এছাড়া জনাতনা সরকারের একটা পত্রিকা আছে, জনাতনা রাজ (জনতার রাষ্ট্র)।

পড়াশুনার জন্য ক্লাস হয়। তাতে পড়ার নির্দিষ্ট সিলেবাস ও লিখিত নোট থাকে। রাজ্যে বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক ক্লাস করা হয়। কখনো কখনো ৪-৬ মাস থেকে এক বছর জুড়ে শুদ্ধিকরণ অভিযান চলে, তখন চীনের, ফিলিপিনসের ও পেরুর বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ করা হয় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রশিক্ষণের জন্য। সামরিক স্কুলের জন্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক পত্রিকা আওয়ামি জঙ-এর জন্য সামরিক শিক্ষক দল আছে।

দণ্ডকারণ্য এলাকায় নিরক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষার অভাব পার্টির সামনে সমস্যা হিসাবে দেখা দিচ্ছে। আমরা তাই পার্টি ক্যাডারদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য *MAS* বা চলমান শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। এটা শুরু করার পর শয়ে শয়ে পার্টি ক্যাডারকে এর মাধ্যমে শিক্ষিত করা হয়েছে। গণসংগঠনগুলোও শিক্ষার কর্মসূচি নিচ্ছে। নেতৃত্ব ও কমিটি সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে তারা তাদের নিজস্ব সিলেবাস তৈরি করছে।

গণফৌজ তৈরি (এখন গণ মুক্তি গেরিলা বাহিনী) নিয়ে দু-চার কথা

আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আমাদের সেনাবাহিনী গড়ে ওঠার পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি *জানার* জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করবো আমাদের কেন্দ্রীয়

Second Time

দলিলগুলি পড়ে দেখতে। যে কোন বিপ্লবে এর গুরুত্বের কারণে আপনাদের আমি একে বিশেষ গুরুত্ব দিতে অনুরোধ করবো।

যুক্তফ্রন্ট তৈরি নিয়ে দু-চার কথা

গণসংগঠনের ক্ষেত্রে বিগত অনেক বছর ধরে কৃষক, নারী, ছাত্র, যুবা, নাগরিক অধিকার, সাহিত্য সংস্কৃতি, শিশু, জাতিসত্তা, শ্রমিক, কর্মচারী ইত্যাদি নানা ফ্রন্টে আমরা বিকাশলাভ করেছি। যে রাজ্যে পার্টি যত শক্তিশালী, সে রাজ্যে সংগঠন ও ফ্রন্টগুলিও তত জোরালো। যেখানে পার্টি দুর্বল, সেখানে রাজ্য স্তরে গণসংগঠনের সংখ্যাও তত কম। ঠিক এখন, রাজ্য স্তরে ও সর্বভারতীয় স্তরে পার্টির নানা গণ সংগঠন রয়েছে। আমরা চাই, এই গণ সংগঠনগুলো যেন চার শ্রেণীর মৈত্রীর চার শ্রেণীর সংগঠন হয়, পাশাপাশি অন্যান্য অংশেরও প্রতিনিধিত্ব করে। গণ সংগঠনের ওপর এই রকম জোর দিয়ে আমাদের এখন বিভিন্ন ফ্রন্টে ৩০-৪০ টি গণসংগঠন রয়েছে। '৮০ দশকে এমসিসি-র দু-চারটে গণ সংগঠন ছিল, সেখানে তারা গোপনে কাজ করত, কাজের সুযোগও ছিল সামান্যই। অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষক, ছাত্র, সাহিত্য-সংস্কৃতি মনস্ক ও ছাত্রদের মধ্যে খানিকটা প্রভাব ছিল, কিন্তু আমাদের ধ্যানধারণার বিকাশের সাথে সাথে এখন গ্রাম স্তর থেকে রাজ্য স্তর, সেখান থেকে সর্বভারতীয় স্তর পর্যন্ত গণসংগঠন রয়েছে। জনযুদ্ধের নবম কংগ্রেসে ইস্যু ভিত্তিক ও কৌশলগত কারণে গণসংগঠন ও যুক্তফ্রন্ট গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোন কোন ইস্যুতে এমনকি শত্রু শ্রেণী ও স্থানীয় নেতারাও স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি ভাবে একসাথে আসতে পারে। সংযুক্তির পর এর আরও বিকাশ ঘটে। গোষ্ঠীগত স্তরে (sectional), গোপন ও প্রকাশ্যভাবে শ্রেণী সংগ্রাম করতে হবে। আইনি সুযোগগুলি ব্যবহার করতে হবে, কয়েকটি গণসংগঠন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের সাধারণ নির্দেশিকা মেনে কাজ করে। অন্য কয়েকটি কাজ করে একেবারে গোপনে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে

১৯৮০-র দশকের শুরুতে কাজকর্মের ক্ষেত্রে এমসিসি ও জনযুদ্ধ দুটিই ছিল স্থানীয় চরিত্রের, এ কারণে আমরা বড়ো বড়ো আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারি নি। কিন্তু, ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে দুটি পার্টি, এবং সিপিআই(মাওবাদী)-র জন্মের পর থেকে আরো বেশি করে আমরা আন্তর্জাতিকভাবেও একটা ভূমিকা রাখতে শুরু করলাম। সব আন্তর্জাতিক বিতর্কে আমরা অংশ নিই, আন্তর্জাতিক ফোরামগুলিতে প্রতিনিধি পাঠাই, যদিও এ বিষয়ে আরও এগোনোর দরকার রয়েছে। কিন্তু ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকের চেয়ে অবস্থা অনেক ভালো। ২০০২ *সালে* এমসিসি *রিম*-এ যোগ দেয়। কিন্তু জনযুদ্ধ *রিম*-এ যোগ দেওয়ার বিরোধী ছিল, কারণ জনযুদ্ধ মনে করত যে সংকীর্ণতাবাদকে বর্জন করতে হলে অনেক মত-বিনিময়, বোঝাপড়া ও আলাপ-আলোচনার পর তবেই এরকম কোনো আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা যেতে পারে। সংযুক্তির পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে নতুন পার্টি যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই করা হবে। তখন থেকে সম্পূর্ণ পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে পার্টি *রিম*-এর বাইরে থেকেছে। এর মধ্যে *রিম*-ও প্রকৃতপক্ষে স্থবির হয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় বিপ্লবের সাফল্যের জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে কার্যকরভাবে রক্ষা করা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, ও সারা বিশ্ব জুড়ে শ্রেণীসংগ্রামকে সমর্থন করা, এবং আন্তর্জাতিক মাওবাদী পার্টি/সংগঠন/শক্তি, সর্বহারা ও জনগণের সমর্থন গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য আমরা মাওবাদী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক রক্ষা করি। আমরা বিশ্বাস করি যে আন্তর্জাতিক স্তরে সাহায্য করা ও সাহায্য নেওয়া যে কোন বিপ্লবের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আজকের মতো নিপীড়নের যুগে। সব মিলিয়ে, আমি আবার বলবো যে আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের মূলভিত্তির সঙ্গে *জড়িয়ে* আছি। যে কোনো মাওবাদী পার্টি/সংগঠন থেকে সমালোচনামূলক *বক্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই।*

আমি বিশ্বাস করি যে সিপিআই (মাওবাদী) হলো বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের একটি বাহিনী। এটি সাফল্যলাভ করলে আমরা বলবো যে বিশ্বের এক জায়গায় *বিজয়* অর্জিত হয়েছে, অর্থাৎ এটি অন্যদের থেকে আলাদা নয়। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি অংশ হিসাবে এটি কাজ করবে, আর বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক *বিপ্লবের* সাফল্য ও ব্যর্থতার *সঙ্গেও* এটি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। সাম্রাজ্যবাদী/*পুঁজিবাদী দেশে* শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম বাড়লে ভারতের বিপ্লবের উপর তার প্রভাব ভালো হবে।

উৎস : http://indianvanguard.wordpress.com/2010/02/15/jan-myrdal-interviews-cpimaoist-leader-ganapathy/

Second Time